# ১৬ই ডিসেম্বর
# মহান বিজয় দিবস
## ২০২৪

◆ বিশেষ ক্রোড়পত্র ◆ অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ◆ সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০১ পৌষ ১৪৩১
১৬ ডিসেম্বর ২০২৪

## বাণী

১৬ ডিসেম্বর, আমাদের মহান বিজয় দিবস। দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম ও নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সালের এই দিনে আমরা অর্জন করেছি কাঙ্ক্ষিত বিজয়। আমরা পেয়েছি একটি সার্বভৌম দেশ, পবিত্র সংবিধান, নিজস্ব মানচিত্র ও লাল-সবুজ পতাকা। পেয়েছি স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে নিজেদের অস্তিত্ব আর মর্যাদা। বিজয়ের আনন্দঘন এ দিনে আমি দেশে ও প্রবাসে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিকে জানাই বিজয়ের শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

বিজয়ের এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহিদদের, যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি সকল জাতীয় নেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সম্ভ্রমহারা দুই লক্ষ মা-বোন, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক-সমর্থক, বিদেশি বন্ধু, যুদ্ধাহত ও শহিদ পরিবারের সদস্যসহ সর্বস্তরের জনগণকে, যাঁরা আমাদের বিজয় অর্জনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রেখেছেন। আমি আরও স্মরণ করি বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাদেরকে। জাতি তাঁদের অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

স্বাধীনতা বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। তবে এ অর্জনের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ শোষণ-বঞ্চনা, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের করুণ ইতিহাস। ৫২ এর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার যে স্বপ্নযাত্রা শুরু হয়েছিল, দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম ও নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে তা পূর্ণতা পায়। দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয় চূড়ান্ত বিজয়।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করা। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি ও অবকাঠামো পুনর্গঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম ও কৃষি বিপ্লবের শুরু হয়। কিন্তু বিজয়ের পাঁচ দশক পার হলেও জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি এখনো অর্জিত হয়নি। বারবার আমাদের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথচলা বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে।

তবে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি কখনোই থেমে যায়নি। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়নসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এ বছর জুলাই-আগস্ট মাসে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটি বৈষম্যহীন ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন এ দেশের মানুষ দেখেছে তা অচিরেই বাস্তবায়িত হবে বলে আমি মনে করি। বীরের দেশ বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করবে-ইনশাল্লাহ।

বাংলাদেশ বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাসী। যুদ্ধ কোনো দেশের জন্য কাঙ্ক্ষিত নয়। বাংলাদেশ মনে করে আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব। আন্তর্জাতিক সমস্যার মানবিক সমাধানে বাংলাদেশ সর্বদা আন্তরিক। ইসরায়েল কর্তৃক ফিলিস্তিন ও লেবাননের বিভিন্ন অঞ্চলে নিরীহ-নিরস্ত্র জনগণের ওপর বর্বরোচিত বোমা হামলার তীব্র নিন্দা জানায় বাংলাদেশ। ফিলিস্তিনি জনগণের যে কোনো ন্যায্য অধিকার আদায়ে বাংলাদেশ সবসময় তাদের পাশে থাকবে। বাংলাদেশে অবস্থানরত বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও সম্মানজনক প্রত্যাবর্তন এবং এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কার্যকর অবদান রাখবে- এই প্রত্যাশা করি।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসীদের অবদান অনস্বীকার্য। আমাদের প্রবাসী ভাইবোনেরা তাদের কষ্টার্জিত রেমিটেন্স দেশে প্রেরণের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। জাতি তাদের অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে। আমি আশা করি, বিশ্বমন্দা ও অর্থনীতির এই ক্রান্তিকালে প্রবাসীগণ রেমিটেন্স প্রেরণ অব্যাহত রাখবেন এবং দেশের উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখবেন।

লাখো শহিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পরমতসহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। তাই আসুন, ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি বৈষম্যমুক্ত দেশ গড়তে এবং মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য বাস্তবায়ন ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে আরও বেশি অবদান রাখি। দেশ ও জাতিকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে আরও এগিয়ে নিয়ে যাই, গড়ে তুলি উন্নত-সমৃদ্ধ এক নতুন বাংলাদেশ—মহান বিজয় দিবসে এই আমার প্রত্যাশা।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মো. সাহাবুদ্দিন

# ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ এক নতুন বিজয় দিবস

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন এনডিসি, পিএসসি

আমরা মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ৫৩ বছর এবং বিজয় দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন করলেও এ যুদ্ধের শুরু বহুযুগ আগে ভারত বিভাজন ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হতে। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালিদের প্রতিনিয়ত শোষণ আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার সংগ্রাম জীবনযুদ্ধে পরিণত হয়েছিলো। এ সংগ্রাম ছিলো বৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের, যার প্রায় ৫৩ বছর পর জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এ ছাত্র-জনতার রক্তক্ষয়ী গণঅভ্যুত্থান আমরা প্রত্যক্ষ করি।

এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পেছনেও ছিলো দীর্ঘদিনের শোষণ আর বৈষম্য। তবে এবারের সংগ্রাম কোনো বিদেশি বা ভিনভাষার শোষকদের বিরুদ্ধে ছিলো না বরং ছিলো প্রায় ১৬ বছরের নিজেদের শাসক শ্রেণির শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বহু রক্তক্ষরণের পর জনতার বিজয়। তাই হয়তো আমাদের তরুণরা এ সংগ্রামের নাম দিয়েছে দ্বিতীয় স্বাধীনতা।

যাই হোক আমাদের সমগ্র স্বাধীনতা যুদ্ধ খুব একটা সংঘটিত না হলেও শুরু হয় মার্চ ২৫, ১৯৭১ এর মধ্যরাত হতে যখন পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালি নিধনে নামে। যদিও এ যুদ্ধের সূত্রপাত ছাত্র-জনতা এবং বাঙালি সৈনিকদের সমন্বয়ে। স্মরণযোগ্য যে অকুতোভয় অফিসারদের নেতৃত্বে সংগঠিত ও পরিচালিত হয় নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ, যাতে ক্রমেই যোগ দিতে থাকেন ছাত্র ও আপামর জনতা।

তবে ঐ যুদ্ধের সৈনিকরাও অর্থাৎ তরুণ সামরিক আধাসামরিক এবং ছাত্র-জনতা ২০২৪ এর জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের ছাত্র-জনতার মতো ছিলেন অকুতোভয়। ২৫ মার্চ, ১৯৭১ এর মধ্যরাতে

পাক-বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে দেশের আপামর জনতা হয়ে পড়ে দিশেহারা। রাজনৈতিক নেতারাও কোনো নির্দেশনা দিচ্ছিলেন না। যদিও ১৯৭০ এর পর হতে তৎকালীন আওয়ামী লীগের তথা পাকিস্তানের বৃহত্তর পার্টির নেতা শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠিত কিন্তু স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার ব্যাপারে তিনি নিষ্ক্রিয় থেকেছেন। ঐ সময়কার একাধিক নেতৃবৃন্দের উপরে রচিত বই পুস্তকে পাওয়া যায় যে ২৫ মার্চ ১৯৭১ হতে ২৭ মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত পাক-বাহিনীর আক্রমণের মুখে ছাত্র-জনতা প্রতিরোধের জন্য তৈরি থাকলেও কোনো রাজনৈতিক নেতার পক্ষ হতে বাঙালির রুখে দাড়াঁবার কোনো ঘোষণা আসেনি।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

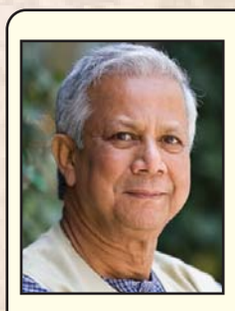

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০১ পৌষ ১৪৩১
১৬ ডিসেম্বর ২০২৪

## বাণী

আজ ১৬ই ডিসেম্বর, বিজয় দিবস। এ দিনটি বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গৌরবময় এবং স্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর, মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীনতার স্বাদ এবং জাতি হিসেবে নিজস্ব পরিচিতি। লাখ লাখ শহিদের রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়ে যাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

বিজয় দিবস কেবল আমাদের গর্বের উৎস নয়, এটি আমাদের শপথের দিনও। শপথ আমাদের একতাবদ্ধ থাকার, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করার।

আজকের এই দিনে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহিদদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি এবং তাদের আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান জানাই। ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত অন্তবর্তী সরকার একটি উন্নত, সমৃদ্ধ এবং সুশাসিত বাংলাদেশ গঠনে সবাই মিলে একসাথে কাজ করার অঙ্গীকার করছে।

আমাদের দেশকে আরও উন্নত ও শক্তিশালী করতে এবং স্বাধীনতার পূর্ণ সুফল ভোগ করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

আমি 'বিজয় দিবস ২০২৪' এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

# বিজয় দিবস : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনিবার্য বিজয় ঘোষণার স্মৃতিবহ দিন

অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান, পিএইচডি

বিজয় মানে চূড়ান্ত মুক্তির এক আনন্দবার্তা যা মানুষমাত্রেরই কাম্য। ১৯৭১ সালে সংঘটিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাটি আরও বেশি করে প্রযোজ্য। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা যে অবিস্মরণীয় বিজয় অর্জন করেন তা বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমায় বসবাসকারী প্রতিটি মানুষের কাছেই বিশেষ গুরুত্ববহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ। নব্য উপনিবেশবাদী পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ নয় মাস ধরে চলা আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে ১৬ ডিসেম্বরের এই ঘটনাবহুল দিনে। সেদিন যৌথবাহিনীর কাছে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্যদিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে 'বাংলাদেশ' নামে আরেকটি নতুন দেশ জন্মলাভ করে। তাই আমাদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা বিনির্মাণে এবং বিশ্ববাসীর কাছে আমাদের নিজস্ব জাতিগত পরিচয় তুলে ধরার ক্ষেত্রে ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় তাৎপর্যবাহী।

১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বরে অর্জিত এই বিজয়ের একটি দীর্ঘ ও বেদনাবিধুর পটভূমি রয়েছে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের দখলমুক্ত হয়ে ভারত বিভাজনের ফলে মুসলিম সংখ্যাধিক্যের কারণে পূর্ববাংলা পাকিস্তানভুক্ত হয় এবং ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের সংবিধানে এটি 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে পরিচিতি লাভ করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির ফলে পূর্ববাংলার অধিবাসী প্রতিটি বাঙালি মুসলিমই নিজেদের সার্বিক মুক্তির ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে ওঠে। এই 'সার্বিক মুক্তি' বলতে বুঝায় তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মুক্তিকে।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ববাংলার মানুষদের মোহমুক্তি ঘটে। কারণ, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক ও জনগোষ্ঠী আধা-সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বাঙালিদেরকে নতুন করে শোষণে মেতে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান-এই দুই দূরবর্তী অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলেও এই দুই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ভাষাগত, নৃ-গোষ্ঠী এবং আর্থসামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। তাই পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে বাঙালির ওপর এক ধরনের শোষণজনিত নেতৃত্বদানের ভাবনা জেগে ওঠে। ফলে এরই অংশ হিসেবে তারা প্রথমেই আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য তথা

মাতৃভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার কেড়ে নিতে চায়। স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম গভর্নর জেনারেল এবং স্থপতি কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে ঢাকায় আগমন করেন। ২১শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটবর্তী রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তিনি ঘোষণা করেন যে, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। জিন্নাহর এই ঘোষণার সাথে সাথে ছাত্ররা এর তীব্র প্রতিবাদ করে। এভাবেই পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং ভাষার অধিকারকেন্দ্রিক এই আন্দোলন পর্যায়ক্রমে সারা পূর্ববাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। এরই চূড়ান্ত রূপ পরিলক্ষিত হয় ১৯৫২

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ডিএফপি নং. ০৯/১৫.১২.২০২৪

## বুলেটের মাহফিল

**হাসান রোবায়েত**

এই তো ঈশা খাঁ বারো ভুঁইয়ার ঘোড়া
বাতাসে হেলান দিয়ে শুনতেছে সুর
কারা পড়তেছে চর্যাপদের গান
ঢাকার গলিতে কাহ্নপা কতদূর!

এখানে বাড়ির পাশে সারাদিন হাসে
ডোমিনী বঁধুয়া সার্বভৌম হাসি
মহুয়ার হাতে পানি খায় চিরকাল
বখতিয়ার ও চাঁদ রায় পাশাপাশি।

পলাশীর মেঘে ফুটে ওঠে মতিউর
শাপলার বিলে কারা করে ক্রন্দন?
মহাশূন্যের চূড়ায় নির্বিকার
ঝুলে আছে একা বাংলাদেশের বোন।

মুক্তি কি তবে খনার আধেক জিভ?
দর্জিরা এসে সেলাই করবে কথা?
শাহ জালালের সন্তান দেবে জান
আর রাক্ষসী গিলে খাবে স্বাধীনতা?

ডোরাকাটা হাওয়া দুপুরের মওসুমে
ঈশা খাঁ দিয়েছে কবে সাহসের খিল
বিজয় যেনবা রক্তের পাপড়িতে
হেসে ওঠা কোনো বুলেটের মাহফিল!

## ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ এক নতুন বিজয় দিবস

পাক-বাহিনীর হামলা শুরু হয় তৎকালীন ইপিআর (বর্তমানে বিজিবি) এর পিলখানার বাঙালি সৈনিকদের উপরে এবং যুগপৎ রাজারবাগ 'পূর্ব-পাকিস্তান' পুলিশদের উপর যার সিংহভাগ ছিলেন বাঙালি কনস্টেবল। তাৎক্ষণিক এ আক্রমণে প্রচুর সদস্য শহিদ হন এবং বেশ কিছু সদস্যরা স্বউদ্যোগে অস্ত্র নিয়ে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করেন। অপরদিকে ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট যার সিংহভাগ সদস্য ছিলো বাঙালি সৈনিক তাদের মধ্যে তরুণ অফিসারগণ আসন্ন হামলা প্রতিহত করতে প্রস্তুত থাকলেও কোনো ধরনের আহ্বানের কথা শোনা যায়নি। একইভাবে সমগ্র বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের) বাঙালি সৈনিকগণের উপর হামলা হলেও আত্মরক্ষা করা ছাড়া তারা সংঘটিত হতে পারেনি। এরমধ্যে বহু তরুণ অফিসার এবং সৈনিকদের শহিদ করা হয়। এছাড়াও বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ গড়ে তুললেও সমগ্রজাতি দিকনির্দেশনাবিহীন থাকে ২৭ মার্চ, ১৯৭১ পর্যন্ত।

অবশেষে ২৭ মার্চ, ১৯৭১ সালে চট্টগ্রামের কালুরঘাটের বেতার কেন্দ্রের রিলে যন্ত্রের মাধ্যমে ৮ম বেঙ্গলের মধ্য র‍্যাংকের অফিসার, মেজর (পরবর্তীকালে সেক্টর কমান্ডার, সেনাপ্রধান ও শহিদ রাষ্ট্রপ্রতি) জিয়াউর রহমান স্বউদ্যোগে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এই ঘোষণা পরবর্তী সমগ্র বাঙালি জাতি বিশেষ করে সমগ্র সৈনিকদের একত্রিত হতে এবং দেশকে পাক-হানাদারদের হাত হতে রক্ষা এবং স্বাধীনতা অর্জনের পথে দিকনির্দেশনা দেয়। এসময় মুক্তিযুদ্ধের আরেক অন্যতম সেক্টর কমান্ডার ও প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা প্রয়াত মেজর (পরে ব্রিগ্রেডিয়ার) খালেদ মোশারফ ছিলেন সিলেট অঞ্চলে। তিনি (খালেদ মোশারফ) বলেন যে ২৭ মার্চ, ১৯৭১ সালের জিয়াউর রহমানের ঘোষণার পর তাঁরা দিকনির্দেশনা পান এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে সীমানা অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যদিও তিনি প্রথমে বেশ কয়েকদিন দেশের মধ্য থেকেই যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন। তেমনি ঢাকা, যশোর, কুমিল্লা এবং চট্টগ্রামের বাঙালি সৈনিক, পুলিশ এবং তৎকালীন ইপিআর বিদ্রোহ করেন। পরবর্তি সময় তারা বেঙ্গল রেজিমেন্টের নেতৃত্বে যুক্ত হতে থাকেন।

অবশ্য পরবর্তীকালে ২০২৪ সালের পতিত স্বৈরাচার সরকারের দলের নেতৃবৃন্দ যেভাবে তাদের নেতা ও ঐ সময়ের একমাত্র নেতা মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানকে কৃতিত্ব দিতে গিয়ে যে কাহিনি ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তা কোনো যুক্তি ও তথ্য প্রমাণে টেকেনা। কারণ বক্তব্যগুলো অযৌক্তিক ও অসংলগ্ন। বলা হয় যে, ঐ সময় মানে ২৫ মার্চ, ১৯৭১ গভীররাতে শেখ সাহেবের চিরকুট নিয়ে কেউ একজন তৎকালীন ইপিআর (বর্তমানে বিজিবি) এর প্রধানকেন্দ্র পিলখানায় স্থাপিত বেতারের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছিলেন। এ দাবির যৌক্তিকতা একেবারেই নেই বলে আমি মনে করি। কারণ যখন পরিকল্পিতভাবে পাক-বাহিনী ২৫ তারিখের আগের প্রহরেই সমস্ত প্রচারযন্ত্র, রেডিও এবং সমস্ত ওয়্যারলেস কেন্দ্র দখলে নিয়ে নেয়। সে ক্ষেত্রে তৎকালীন ইপিআর এর মতো পিলখানায় অবস্থিত বেতারকেন্দ্র (ওয়্যারলেস) স্বাধীনতার ঘোষণার জন্য বাঙালিদের দোসর হয়ে কাজ করবে এমন তত্ত্ব ধোপে টেকে না।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এক অনন্য বিষয়। যদিও ভারতের সহযোগিতা অবশ্যই অনস্বীকার্য তবে সে সহযোগিতা যে শুধু বাঙালিদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় তা নয়। ভারতের কত বড়ো অর্জন হয়েছে তা ঐ দেশের ভূ-রাজনীতিবিদ হতে সাধারণ বিশ্লেষকরাও তাদের বই-পুস্তকে লিখেছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ যেভাবেই শুরু হোক লক্ষ জনমানবের যোগদানের কারণে এ যুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছে। কাদেরিয়া বাহিনী এই জনযুদ্ধের এক অনন্য উদাহরণ। তাছাড়া ক্র্যাকপ্লাটুন, বিচ্ছু বাহিনী এবং বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্সেস সবারই অগ্রগামী ভূমিকা এবং ভূ-কৌশলগত কারণে পাক-বাহিনীর পরাজয়ের মুখে যৌথবাহিনী চরম আঘাত হানে তারই ফলাফল ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ এবং আমাদের বিজয় দিবস। সে দিন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বিশ্ব সামরিক ইতিহাসের সবচাইতে বড়ো আত্মসমর্পণ হয়েছিলো কথিত যৌথবাহিনীর নিকট। কার্যত সেখানে আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলাদেশের কোনো প্রতিনিধি ছিল না। তৎকালীন উপ প্রধান এয়ার কমোডোর (পরে এয়ার ভাইস মার্শাল ও আওয়ামী লীগের মন্ত্রী) স্বউদ্যোগে হাজির হন। তথাপি ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী সাড়ে ৭ কোটি (ঐ সময়ের হিসেবে) বাঙালির ইতিহাসের সবচাইতে বড়ো পাওয়া- আমাদের বিজয়।

আমরা বাংলাদেশিরা আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে গর্বিত। গর্বিত ১৬ ডিসেম্বর নিয়েও। এ স্বাধীনতা কারো দয়ার দান নয়, লক্ষ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত আর লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতা। বাঙালির ইতিহাসে এই প্রথম আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রকে কোনো ভাবেই ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না বা কারও তাবেদার থাকবে না তা দেখিয়েছে জুলাই-আগস্ট এর ছাত্র-জনতা রক্তের দানের মাধ্যমে।

এবারের ১৬ ডিসেম্বর হবে দ্বিতীয় নয় এক নতুন পূর্ণাঙ্গ বিজয় দিবস।

*লেখক: নৌপরিবহন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা*

## অনন্ত মুক্তিযুদ্ধ

**রওশন আরা মুক্তা**

ঝরাপাতা উড়ে যায়, রাজপথের ধুলোর সাথে
ফ্লাইওভারের গোঁড়ায়, মজ্জুবদের বসবাস যেখানে
গনগনে সূর্যের দিনে, ফুটপাতের পাশ দিয়ে
সাঁই সাঁই ছোটা বাসের ভিড়ে, ঝরাপাতা যাচ্ছে উড়ে
-শহর থেকে গ্রামে অনন্ত মুক্তিযুদ্ধের ফরমান নিয়ে।

হাজার বছর ধরে ঝরাপাতা উড়ছে বাউল গানের রাতে
ভোরবেলায় হেঁটে যাওয়া নামাজির সাথে সাথে
শিবের গাজনে, বৈসাবির পাজনে, দোল পূর্ণিমাতে।
নবান্নে ফসল তোলার আনন্দে, কৃষকের হাসিতে
ঝরাপাতা উড়ছে মাজারে মাজারে, শবে-বরাতে
-শিশুদের চোখে প্রতিফলিত তারাবাতির ঝলকানিতে।

প্রাগৈতিহাসিক এই ওড়াওড়ি-কাহিনিগুলো ভালোবাসার,
ভিতরে ঘৃণার মোহর আঁটা, কাহিনিগুলো ঘৃণার, ওপরে
ভালোবাসার মোড়ক সাঁটা-কী ঘটেছিলো রাজারবাগে?
আর কী ঘটলো যাত্রাবাড়ী? মানুষের হাতেই মরলো মানুষ,
এখনো একই আগুনে পুড়ছে মানুষের ঘরবাড়ি!

এখনো ঝরাপাতা উড়ে যায়, স্লোগানে প্রকম্পিত রাজপথে
এখনো ঝরাপাতা যুদ্ধে যায়, মা-বাবাকে চিঠি লিখে রেখে
এখনো ঝরাপাতা কেঁদে যায়, কন্যা হন্তারক বুলেটের দাগ দেখে।
এখনো ঝরাপাতারা মুক্তি চায়! অদেখা বিজয়ের সব কবিতা-
লিখে যাচ্ছে ওই ঝরাপাতারাই, ও ঝরাপাতারে;
ফেলানী নামের যে মেয়ে ঝুলে থাকে সীমান্তের কাঁটাতারে।

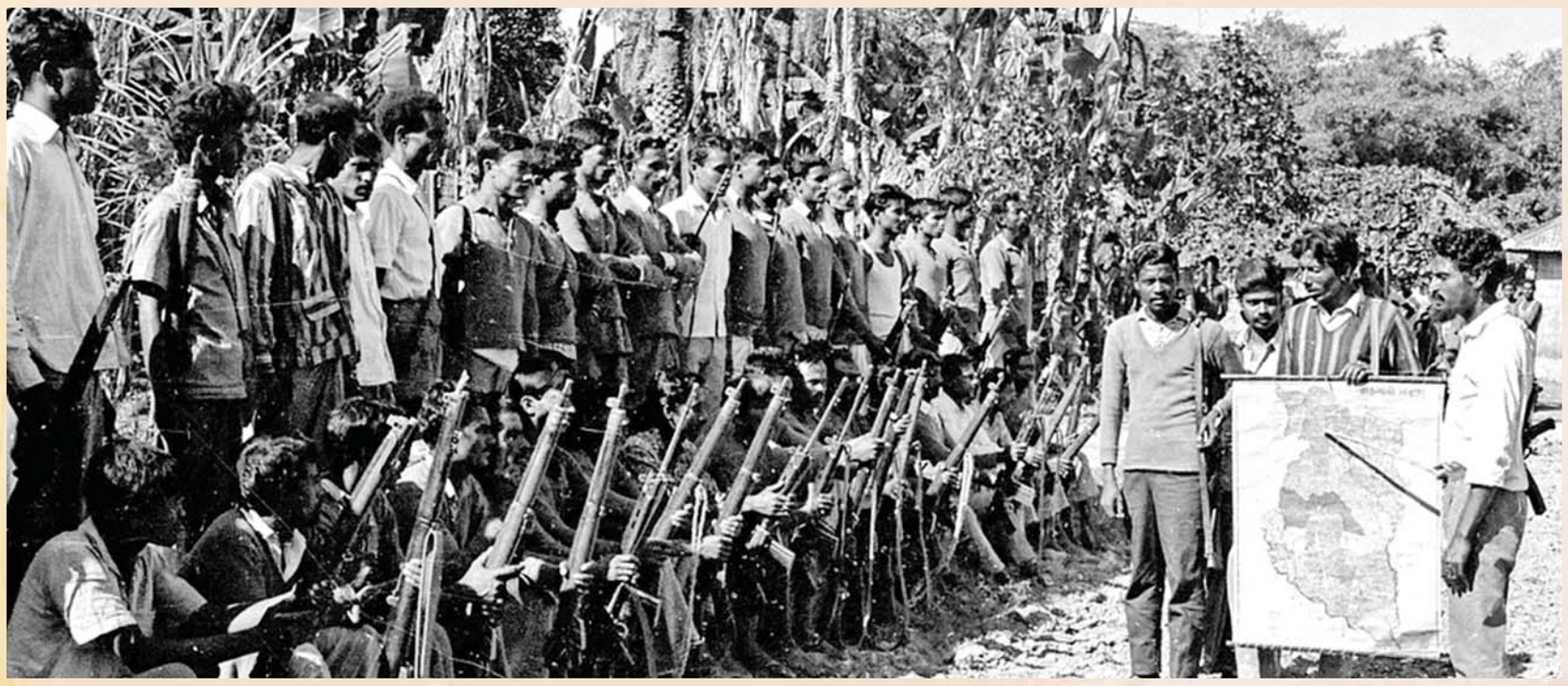

## বিজয় দিবস: বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনিবার্য বিজয় ঘোষণার স্মৃতিবহ দিন

সালে ২১ ফেব্রুয়ারিতে; যেদিন অন্যায়ভাবে জারি করা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে এগিয়ে যাওয়া ছাত্র-জনতার ওপর পাকিস্তানি পুলিশ বাহিনী গুলি বর্ষণ করে। এতে সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ অনেক তরুণ মৃত্যুবরণ করেন।

এই রক্তদানের ফলেই পাকিস্তান সরকার বাঙালির প্রাণের দাবি মেনে নেয় এবং পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালির মাতৃভাষা বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করলেও তৎকালীন পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনসাধারণের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকারেও হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। পূর্ব পাকিস্তানের পাট এবং অন্যান্য কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানি করে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় তার বেশির ভাগই ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক এবং শিল্পোন্নয়নে। ফলে বাঙালিরা আর্থিকক্ষেত্রে দারুণভাবে বঞ্চিত ও বৈষম্যের শিকার হয়।

ভাষাগত ও অর্থনৈতিক শোষণের পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তানের অগণতান্ত্রিক শক্তি আমাদের মুক্তচিন্তার রাজনৈতিক চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রেও বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তারা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক দাবি বাস্তবায়ন, আন্দোলন, মিছিল, সভা-সমাবেশ ইত্যাদি আয়োজনেও চরমভাবে বাধা দিতে শুরু করে, যাতে তাদের শোষণমূলক ও স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের প্রকাশ লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। ১৯৬২-এর ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা, ১৯৬৯ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং গণ- অভ্যুত্থান তারই প্রমাণ। মূলত পশ্চিম পাকিস্তানের জবরদস্তিমূলক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠী আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে তৎপর ও প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে, উল্লিখিত আন্দোলনগুলো এরই সার্থক বহিঃপ্রকাশ। এসব আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালি মূলত তাদের সার্বিক মুক্তি ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। এই ক্ষেত্র প্রস্তুতির পর্বে পাকিস্তানি শাষকগোষ্ঠী আমাদের রাজনৈতিক অধিকার চর্চায় চূড়ান্ত প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল উপেক্ষার মাধ্যমে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক ধারা বাধাগ্রস্ত করে। এক্ষেত্রে নানারকম টালবাহানা সৃষ্টি করে পূর্ব বাংলার মানুষের রাজনৈতিক অধিকার হরণের অপচেষ্টা করে। ফলে বাঙালি জনগোষ্ঠী স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত হয়ে ওঠে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চে শুরু হয় বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম– মহান মুক্তিযুদ্ধ।

এই সংগ্রাম ও যুদ্ধে নিরস্ত্র বাঙালি জনগোষ্ঠীর ওপর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বর্বরভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাঁরা অসংখ্য মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে শুরু করে। শুরু হয় ছাত্র-শ্রমিক-জনতার সশস্ত্র প্রতিরোধ ও লড়াই। সৈনিকসহ পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়। এইভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিণত হয় একটি জনযুদ্ধে। দীর্ঘ ৯ মাস ধরে চলা এই যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে; যখন বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা ও যৌথবাহিনীর কাছে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ করে। এর মধ্য দিয়ে আমাদের নয় মাসব্যাপী চলা সশস্ত্র সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয় এবং পৃথিবীর মানচিত্রে 'বাংলাদেশ' নামে নতুন একটি স্বাধীন দেশের জন্ম হয়।

আমাদের জাতীয় জীবনে ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় দিবস নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। এই রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে আমাদের সার্বভৌমত্ব যা একটি স্বাধীন দেশের জন্য অপরিহার্য এবং অবশ্যম্ভাবীও বটে। ১৬ ডিসেম্বরের এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে আমরা ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল সীমানার একটি স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছি যেখানে পতপত করে উড়তে থাকে আমাদের বিজয়, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক লাল-সবুজের রঙখচিত আমাদের জাতীয় পতাকা। এই পতাকার রঙের সাথে মিশে আছে আমাদের আদিগন্ত বিস্তৃত অবারিত সবুজ মাঠের অসীমতা এবং সকালে সূর্য উদয়ের অফুরান স্বপ্ন ও সম্ভাবনা, যার মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ উদ্দীপনা লাভ করে।

এই ঐতিহাসিক বিজয় আমাদেরকে দিয়েছে দেশমাতৃকার প্রশস্তিসূচক একটি জাতীয় সংগীত যেটি দেশ-বিদেশে নানা অনুষ্ঠানে আমাদের পরিচয় ও স্বাতন্ত্র্যকে তুলে ধরে। সবমিলিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের এই ঐতিহাসিক বিজয় আজ বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের অস্তিত্বের স্মারক হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিধন্য ১৬ ডিসেম্বরের এই আবেগঘন মুহূর্তে আমি প্রথমেই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক নেতৃবৃন্দসহ এই যুদ্ধ সফলকারী সর্বস্তরের সামরিক ও বেসামরিক পেশাজীবী এবং ছাত্র-জনতাকে। আমি বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে চাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং যুদ্ধের ময়দানে শাহাদতবরণকারী সকল বীর শহিদকে যাঁদের অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে আজকের এই স্বাধীন বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

১৬ ডিসেম্বরের এই চূড়ান্ত বিজয়ের দিনে, এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে নিহত সকল শহিদকেও বিশেষভাবে স্মরণ করছি। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মত্যাগকারী মুক্তিযোদ্ধারা যেমন আমাদেরকে নতুন দেশ, ভূখণ্ড এবং সার্বভৌমত্ব প্রদান করেছেন, তেমনি ২০২৪ সালের আত্মত্যাগকারী এই বীর ছাত্র-জনতা আমাদেরকে এনে দিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ও ন্যায্যতাভিত্তিক এক সম্ভাবনার নতুন বাংলাদেশ। তাঁদের স্বপ্নের হাত ধরে আমরা যদি একটি বৈষম্যহীন, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত, আধুনিক ও প্রগতিশীল বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হই, তাহলেই কেবল ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী সকল শহিদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

*লেখক : উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*